بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মহান মর্যাদা সসম্পন্ন বদরী সাহাবা হযরত উবায়েদ বিন যায়েদ আনসারী, হযরত যাহের বিন হারাম আলআশজাঈ, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব, হযরত উবাদা বিন খাশখাশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ এবং হযরত হারেস বিন অউস বিন মায রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাইনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৭ ডিসেম্বর ২০১৮-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আজ যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত যায়েদ বিন উবায়েদ আনসারীর। তার সম্পর্ক ছিল বনু আজলান গোত্রের সাথে। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত মায বিন রিফা তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন- আমি আমার ভাই হযরত খাল্লাদ বিন রাফের সাথে মহানবী (সা.) এর সাথে একটি দুর্বল উটে বসে বদরের অভিমুখে যাত্রা করি। আমাদের সাথে উবায়েদ বিন যায়েদও ছিলেন। আমরা যখন বারিদ নামক স্থানে পৌঁছলাম যা রওহা নামক স্থানের পেছনে অবস্থিত। তখন আমাদের উট বসে যায়। আমি দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! তোমার খাতিরে মানত করছি, যদি আমরা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যাই তাহলে আমরা এই উটের কুরবানী করব। আমরা এই অবস্থাতেই ছিলাম, মহানবী (সা.) আমাদের পাশ দিয়ে যান। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের উভয়ের কী হয়েছে। আমরা তাকে পুরো বৃত্তান্ত শুনাই। তিনি আমাদের কাছে থামেন এবং ওযু করেন। ওযুর অবশিষ্ট পানিতে তাঁর মুখের পবিত্র লালা মিশ্রিত করেন। এরপর তাঁর নির্দেশে আমরা উটের মুখ খুলে দিই। তিনি উটের মুখে কিছুটা পানি ঢেলে দেন। এরপর কিছুটা তার মাথায়, কিছুটা তার ঘাড়ে, কিছুটা তার কাঁধে, কিছুটা তার কুঁজে, কিছুটা তার পিঠে আর কিছুটা তার লেজে ঢেলে দেন। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! রাফে এবং খাল্লাদকে এই উটের পিঠে করে নিয়ে যাও। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) প্রস্থান করেন। আমরাও যাত্রার জন্য দাঁড়িয়ে যাই এবং যাত্রা করি। এক পর্যায়ে আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে মানসাফ নামক স্থানের প্রবেশ পথে মিলিত হই। অর্থাৎ সেখানে গিয়ে মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হই। কাফেলায় আমাদের উট সর্বাগ্রে ছিল। মহানবী (সা.) আমাদেরকে দেখে মুচকি হাসেন। আমরা সফর অব্যাহত রাখি। এক পর্যায়ে আমরা বদরের প্রান্তরে পৌঁছে যাই। বদর থেকে ফেরার পথে আমাদের উট মুসাল্লা নামক স্থানে পৌঁছে বসে যায়। তখন আমার ভাই এটিকে জবাই করে এর মাংস সদকা হিসেবে বিলিয়ে দেন। এই সফরে তার সাথে হযরত উবায়েদ বিন যায়েদ আনসারীও ছিলেন।

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত যাহের বিন হারাম আলআশজাঈ। তিনিও একজন বদরী সাহাবী। তার সম্পর্ক ছিল আশজা গোত্রের সাথে। বদরের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মরুবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ছিলেন যার নাম ছিল যাহের। তিনি মহানবী (সা.) এর জন্য গ্রামের শাকসবজি নিয়ে আসতেন। তার ফেরার পথে মহানবী (সা.)ও তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনসম্পদ দিয়ে ফেরত পাঠাতেন। একদিন যা ঘটেছে তাহলো, হযরত যাহের বাজারে নিজের কিছু পণ্য বিক্রি করছিলেন। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন। পেছন থেকে তাকে নিজের বুকে টেনে নেন। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) পেছন থেকে এসে নিজের হাত দ্বারা তার চোখ আবৃত করেন। হযরত যাহের বাহ্যত হুযূরকে দেখছিলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু তিনি যখন ফিরে তাকান, তখন মহানবী (সা.) কে দেখেন এবং তাঁকে চিনে ফেলেন। হযরত যাহের কিছুটা পিছনে তাকান, চেহারায় তার দৃষ্টি পড়ে থাকবে, এখানে চেনার অর্থ হলো- কিছুটা ফিরে তাকালে বুঝতে পেরেছেন যে, মহানবী (সা.)। তখন তিনি নিজের পিঠ মহানবী (সা.) এর পবিত্র বক্ষে ঘষতে থাকেন। মহানবী (সা.) রসিকতার ছলে বলা আরম্ভ করেন, কে এই দাসকে ক্রয় করবে। হযরত যাহের নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাহলে তো আপনার ব্যবসা আমার জন্য লোকসানে পর্যবসিত হবে। কে আমাকে ক্রয় করবে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তুমি লোকসানজনক নও। অথবা বলেছেন, খোদার সন্নিধানে তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।

একবার মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক শহুরে নাগরিকের কোন না কোন গ্রাম্য বন্ধু থেকে থাকে। আর মুহাম্মদ পরিবারের

গ্রাম্য বন্ধু হলেন যাহের বিন হারাম। পরবর্তীতে যাহের বিন হারাম কুফায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।
এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব। তিনি হযরত ওমরের বড় ভাই ছিলেন। হযরত ওমরের মুসলমান হওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রারম্ভিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া এবং বয়আতে রিযওয়ানসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত মাআন বিন আদী-র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন এই উভয় সাহাবী ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। ওহুদের দিন হযরত ওমর হযরত যায়েদকে খোদার কসম দিয়ে বলেন, হযরত যায়েদ হযরত ওমরের বড় ভাই ছিলেন, আমার এই বর্ম পরে নাও। যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদ স্বল্পক্ষণের জন্য সেই বর্ম পরিধান করেন, এরপর খুলে ফেলেন। হযরত ওমর বর্ম খুলে ফেলার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমিও সেই শাহাদতের বাসনা রাখি যা আপনি কামনা করেন। আর তারা উভয়েই বর্ম রেখে দেন।
হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে বর্ণিত হ য়েছে যে, বিদায় হজের সময় মহানবী (সা.) বলেন, নিজেদের দাসদের প্রতি যত্নবান থাকবে। দাসদের প্রতি যত্নবান থাকবে। তোমরা যা খাও তা থেকেই তাদের খাওয়াও। আর তোমরা নিজেরা যা পরিধান কর তা থেকেই তাদের পরিধান করাও। আর তোমরা ক্ষমা করতে চাও না এমন কোন ভুল যদি তাদের দ্বারা হয়ে যায় তাহলে হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তাদেরকে বিক্রি করে দিও, শাস্তি দিও না। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন মুসলমানদের পদস্খলন হয়, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব উচ্চস্বরে এই দোয়া আরম্ভ করেন যে, হে আল্লাহ্‌! আমার সাথিদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর মুসায়লামা কাযযাব এবং মাহাকামা বিন তোফায়েল যে কাজ করেছে, আমি তোমার সামনে তা থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি। এরপর পতাকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে শত্রুর সারিতে এগিয়ে গিয়ে নিজের তরবারি পরিচালনার দক্ষতা প্রদর্শন করতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি শাহাদত বরণ করেন। হযরত যায়েদের শাহাদতের পর হযরত উমর বলেন খোদা যায়েদকে করুণাসিক্ত করুন। দুটো পুণ্যে আমার ভাই আমার চেয়ে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলামও আমার পূর্বে গ্রহণ করেছে আর শহীদও আমার পূর্বে হয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত ওমর যখন মুতাম্মাম বিন নাওয়ায়রাকে তার ভাই মালেক বিন নাওয়ায়রার স্মরণে শোকগাথা গাইতে শুনেন, তখন তিনিবলেন, যদি আমিও তোমার মতো ভালো কবিতা গাইতে পারতাম তাহলে আমিও আমার ভাই যায়েদের স্মরণে এমন শোকগাথাই শুনাতাম যেমনটি তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য গেয়েছ। তখন মুতাম্মাম বলেন, যদি আমার ভাইও এভাবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেন তাহলে আমি দুঃখভারাক্রান্ত হতাম না। তখন হযরত ওমর বলেন আজ পর্যন্ত আর কেউ আমার প্রতি সেভাবে সমবেদনা প্রকাশ করে নি যেভাবে তুমি করেছ।
এই ঘটনার আরো একটি বিশদ বিবরণ রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, হযরত ওমর হযরত মুতাম্মাম বিন নুয়ায়রাকে বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য কতইনা দুখভারাক্রান্ত। তখন তিনি তার এক চোখের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার এই চোখ এই দুঃখের আতিসহ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আমার ভালো চোখেও এত কেঁদেছি যে, অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার নষ্ট চোখও এর সাহায্য করেছে। হযরত ওমর বলেন, এটি এমন গভীর বেদনা যে, কেউ নিজের প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য এমন দুঃখ প্রকাশ করেনি। এরপর হযরত ওমর বলেন, আল্লাহ্‌ যায়েদ বিন খাত্তাবের প্রতি দয়ার্দ্র হোন। আমি যদি কবিতা লেখার সামর্থ্য রাখতাম তাহলে আমিও হযরত যায়েদের বিয়োগে সেভাবেই ক্রন্দন করতাম যেভাবে তুমি ক্রন্দন করছ। হযরত মুতাম্মেম বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আমার ভাই ইয়ামামার যুদ্ধে সেভাবেই শহীদ হতেন যেভাবে আপনার ভাই শহীদ হয়েছেন তাহলে আমি কখনো তার জন্য অশ্রু বিসর্জন করতাম না। এ কথা হযরত ওমরের হৃদয়ে রেখাপাত করে আর তিনি নিজ ভাই সম্পর্কে আশ্বস্ত হন। অথচ হযরত ওমর ভ্রাতৃবিয়োগে গভীরভাবে মর্মাহত ছিলেন। তিনি বলতেন যে, যখন প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হয় তা আমার কাছে যায়েদের সৌরভ নিয়ে আসে।
হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবকে আবু মরিয়ম আল হানাফী শহীদ করে। আবু মরিয়মের ইসলাম গ্রহণের পর একবার হযরত ওমর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি যায়েদকে শহীদ করেছ। সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্‌ হযরত যায়েদকে আমার হাতে সম্মানিত করেছেন। আর আমাকে তার হাতে লাঞ্ছিত করেননি। হযরত ওমর আবু মরিয়মকে বলেন যে, সেদিন তোমার মতে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানরা তোমাদের কতজন যোদ্ধাকে হত্যা করে থাকবে? আবু মরিয়ম বলে, চৌদ্দশত বা ততোধিক। হযরত ওমর বলেন, এরা কতইনা ঘৃণ্য লাশ। আবু মরিয়ম বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে জীবিত রেখেছেন। এক পর্যায়ে আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করি যা তিনি তাঁর নবী এবং মুসলমানদের জন্য পছন্দ করেছেন। হযরত ওমর আবু মরিয়মের এই কথায় খুবই আনন্দিত হন। আবু মরিয়ম পরবর্তীতে বসরার কাজী বা প্রধান বিচারপতিও নিযুক্ত হন।
পরবর্তী সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হলো হযরত উবাদা বিন খাশখাশ। ওয়াকিদি হযরত উবাদা বিন খাশখাশের নাম আবদা বিন হাস্‌সাস উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে মান্দা তার নাম উবাদা বিন খাশখাশ আম্বরী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাহোক তার সম্পর্ক ছিল বনী ইসর গোত্রের সাথে। তিনি হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদের চাচাতো ভাই

ছিলেন। আর তার সৎভাইও ছিলেন। বনু সালেমের মিত্র ছিলেন। হযরত উবাদা বিন খাশখাশ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদরের যুদ্ধে কায়েস বিন সায়েবকে বন্দি করেন। হযরত উবাদা বিন খাশখাশ ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে হযরত নু'মান বিন মালেক এবং মুজাযযের বিন যিয়াদের সাথে একই কবরে সমাহিত করা হয়।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ। তার পিতার নাম ছিল জাদ বিন কায়েস এবং ডাক নাম ছিল আবু ওয়াহাব। তার সম্পর্ক ছিল বনু সালামা গোত্রের সাথে, যা আনসারদের একটি গোত্র ছিল। হযরত মুআয বিন জাবাল মায়ের দিক থেকে তার সৎভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত হারেস বিন অউস বিন মায। তিনি অউস গোত্রের সর্দার হযরত সাদ বিন মাযের ভাতুষ্পুত্র ছিলেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যেগাদান করেন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ২৮ বছর বয়সে ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু কতক অন্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি। হযরত হারেস সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেছে। এই অভিযানকালে তার পায়ে আঘাত লাগে। রক্ত ঝরতে থাকে। তাদের এক সাথি হারেস বিন অউসের শরীরে তরবারির খোঁচা লাগে এবং তিনি আহত হন। অর্থাৎ সাথিদের তরবারির খোঁচায় তিনি আহত হন। তার সাথিরা তাকে নিয়ে দ্রুত মদীনায় পৌঁছেন আর মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন অউসের ক্ষতস্থানে তার পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন। এরপর তার আর কোন কষ্ট হয়নি।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কাব বিন আশরাফকে কেন হত্যা করা হয়েছে এ সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত লিখেছেন, তা এখন বর্ণনা করছি। অবশেষে তার যে পদমর্যাদা লাভ হয়, তাহলো, পুরো আরবের ইহুদীরা তাকে নিজেদের নেতা গন্য করা আরম্ভ করে। কিন্তু নৈতিক বা চারিত্রিক দিক থেকে খুবই নোংরা চরিত্রের মানুষ ছিল। গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং উস্কানিতে সে চরম দক্ষতা রাখতো। মহানবী (সা.) এর মদীনায় হিজরতের পর অন্যান্য ইহুদীর সাথে কাব বিন আশরাফও সেই সন্ধির অংশীদার হয়। যাহোক সে সেই সন্ধির অংশীদার হয় যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা এবং যৌথ প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাবের হৃদয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। অবশেষে বদরের যুদ্ধের পর তা এমন রূপ ধারণ করে যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর এবং বিস্ফোরন্মুখ, আর মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির অবতারণা হয়। যখন কাবের উস্কানিতে তাদের চিন্তাধারায় চরম উত্তেজনা সঞ্চার হয়, সে তাদেরকে কাবা-চত্তরে নিয়ে গিয়ে কাবা শরীফের পর্দা তাদের হাতে ধরিয়ে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নেয় যে, যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) কে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করবে ততদিন তারা স্বস্তির নিশ্বাস নিবে না। বলা হয়, তার কথায় মক্কায় আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর সে অন্যান্য জাতির কাছে ধরনা দেয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলে। মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কেও অপলাপ করে। অর্থাৎ তার উত্তেজনাকর কবিতায় অত্যন্ত নোংরা এবং অশ্লীল ভাষায় মুসলমান নারীদের উল্লেখ করে। এমনকি নবী পরিবারের নারীদেরকেও এসব অশালীন কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করে। আর তার কবিতা সর্বত্র প্রচার করে। সবচেয়ে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হলো সে মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আর বিষয় যখন এ পর্যন্ত গড়ায় এবং কাবের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ, বিদ্রোহ, যুদ্ধের উস্কানি, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সার্বিকভাবে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.), যিনি সেই সময় মদীনার প্রধান এবং সর্বোচ্চ শাসক স্বীকৃত হন, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, কাব বিন আশরাফ স্বীয় কুকীর্তির কারণে হত্যাযোগ্য। আরনিজ সাথিদেরকে তিনি (সা.) বলেন যে, তাকে হত্যা করা হোক। কিন্তু তখন যেহেতু কাবের নৈরাজ্যের কারণে মদীনার পরিবেশ এমন ছিল যে, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে তখন হত্যা করা হতো তাহলে মদীনায় গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়ার আর অবর্ণনীয় রক্তপাত ও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। এ কারণে মহানবী (সা.) এই যুদ্ধ, অশান্তি এবং রক্তপাত এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেন যে, তাকে নীরবে হত্যা করা হোক। এই কাজের দায়িত্ব তিনি (সা.) অউস গোত্রের এক নিবেদিত প্রাণ সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামার ওপর ন্যাস্ত করেন।

প্রভাতে তার নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে উত্তেজনা দেখা দেয় আর সবইহুদী উত্তেজিত হয়। পরবর্তী সকালে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের নেতা কাব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) অস্বীকার করেন নি আর এ কথাও বলেননি যে, আমি জানি না বা বলেন নি যে, এমন কিছু ঘটে নি। বরং তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি জান কাব কোন কোন অপরাধ করেছে। এরপর তিনি সংক্ষেপে কাবের চুক্তিভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য ছড়ানো, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি কার্যক্রমের কথা স্মরণ করান। এতে তারা ভয় পেয়ে নির্বাক হয়ে যায় আরতাদের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, হ্যাঁ, কথা তো সত্য, এর শাস্তি এটিই হওয়া উচিত ছিল। এরপর মহনবী (সা.) তাদেরকে

বলেন, অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতের জন্য শান্তি ও সহযোগিতার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হও। আর শত্রুতা এবং নৈরাজ্য এবং অশান্তির বীজ বপন করো না। তখন ইহুদীদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস আর ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার নতুনভাবে অঙ্গীকার করে। আর এই চুক্তিপত্র হযরত আলীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইহুদীরা কাব বিন আশরাফের হত্যার কথা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে অভিযুক্ত করেছে বলেইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই। কেননা তাদের মন বলতো যে, কাব তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ পরবর্তীতে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে,মহানবী (সা.) একটি আইনবিহর্ভূত হত্যা পরিচালনা করেছেন। এটি আন্যায় কাজ ছিল।

তিনি (রা.) এর উত্তরে লিখেন যে, আজকাল তথাকথিত সভ্য দেশগুলোতেও বিদ্রোহ , চুক্তি ভঙ্গ, যুদ্ধর প্ররোচনা আর হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তাই আপত্তি কিসের।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয় হত্যার রীতি সম্পর্কে, অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয় যে, তাকে গোপনে কেন হত্যা করা হলো। এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আরবে তখন রীতিমত কোন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যদিও তারা একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিযু ক্ত করেছিল,তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান কর তেন ঠিকই, কিন্তু একই সাথে স্ব-স্ব সিদ্ধান্ত করতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক গোত্র স্বাধীনও ছিল এবংস্বায়ত্বশাসিতও ছিল। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের জন্য তারা মহানবী (সা.) এর কাছে আসতো। কিন্তু বিভিন্ন গ্রেত্র নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে তা ও করতে পারতো। এমন পরিস্থিতিতে সেই আদালত কোনটি ছিল যেখানে কাবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত হত্যার রায় আদায় করা সম্ভব হতো। ইহুদীরা ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং প্রায় সময় নৈরাজ্য সৃষ্টি করতো? অতএব ইহুদীদের কাছে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। সোলাইম ও গাতফান গোত্রের কাছেও সাহায্য চাওয়ার সুযোগ ছিল না যারা বিগত কয়েক মাসে মদীনায় ছাপা মারার প্রস্তুতি নিয়েছিল। জানা কথা তাদের কাছেও কোন ন্যায়বিচার পাওয়া যেতো না। তিনি (রা.) বলেন, সেসময়কার পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা কর, এরপর ভাব যে, মুসলমানদের জন্য এছাড়া আর কোন্ রাস্তা খোলা ছিল যে, যখন এক ব্যক্তির উস্কানি ও যুদ্ধের ইন্ধন যোগানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে তার জীবনকে নিজের জন্য ও দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি পেয়ে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সুযোগে তাকে হত্যা করা হতো। কেননা অগণিত শান্তিপ্রিয় নাগরিকের জীবন হুমকি কবলিত হওয়া ও দেশের শান্তি বিপর্যস্ত হওয়ার পরিব র্তে এক দুষ্কৃ তকারী ও নৈরাজ্যবাদী নিহত হওয়া শ্রেয়। আল্লাহ তা'লাও একথাই বলেন যে, ফিতনা নৈরাজ্য থেকে ভয়াবহ।

সুতরাং ১৩০০ বছর পর ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের আপত্তি একেবারই অযৌক্তিক, কেননা তখন ইহুদীরা তাঁর কথা শুনে কোন আপত্তি করে নি। সত্যিকার অর্থে দীর্ঘকাল তারা কোন আপত্তি করে নি। অতএব এ ছিল তার অবস্থা। যাহোক, হযরত যায়েদের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনিও তাকে হত্যার অভিযানে যে টিম প্রেরণ করা হয়েছিল তার অংশ ছিলেন। আর ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে ধর্মীয় উগ্রতার যেসব অপবাদ অরোপিত হয়ে থাকে সেসব অপবাদও ভ্রান্ত ছিল। সে শাস্তিযোগ্য ছিল আর মহানবী(সা.) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাকে শাস্তি দিয়েছেন। আজ এই ঘটনার মাধ্যমেই শেষ করছি।আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা ইসলামকেও এসব ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আজকাল মুসলমানদের অবস্থা এমনই। এসব পুরোনো কথা বা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরা ফিতনায় হাবুডুবু খাচ্ছে, নিজেরাই ফিতনার কারণে হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাথেও তারা ফিতনায় জড়িত আর বিভিন্ন মুসলমান সরকার নিজেরাও। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে এসব ফিতনা থেকে রক্ষা করুন আর এ যুগে খোদাপ্রেরীত হেদায়েতদাতাকে গ্রহণ করার তৌফীক দিন যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আগমন করেছেন।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 7 December 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B